জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
খণ্ড ১৫। সংখ্যা ২
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫

ISSN 2519-5816
DOI: doi.org/10.3329/jnujarts.v15i2.87975
Page: 25-39

কবিতার সমাজতত্ত্ব : *সোনালী কাবিন*

সাবিনা ইয়াসমিন*

A Sciological Study of *Sonali Kabin*

Abstract

Al Mahmud stands as a significant figure in Bengali poetry of the 1950s, renowned for fusing lyrical aesthetics with sociological insight. *Sonali Kabin* (1973) is one of his timeless creations. Al Mahmud highlights the economic struggles of rural communities and calls for the equitable distribution of agricultural resources. He frequently incorporates elements of folk culture and folk traditions, using them as powerful tools to bridge the gap between the past and the present, thereby making traditional cultural expressions relevant to modern consciousness. As a poet, Al Mahmud is deeply connected to the roots of Bengali identity. His focus on rural life, women, nature, and traditional culture illustrates his dedication to preserving and revitalizing indigenous narratives. His poetic inquisitiveness is ultimately anchored in the socio-economic, political, and cultural contexts of his time. By doing so, he not only preserves a collective memory but also questions the structural inequalities of modernity. His fusion of sociological insight with lyrical beauty is rare in the Bengali literary tradition. This paper aims to examine the sociological relevance and transformative role of *Sonali Kabin* through a historical-analytical approach, highlighting its socio-political underpinnings and literary significance.

মুখ্যশব্দ: সমাজচৈতন্য, সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব, প্রতি-ইতিহাস, বি-উপনিবেশায়ন, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, উপনিবেশবাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ।

* Sabina Yeasmin, Associate Professor, Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka.
sabinayeasmin450@gmail.com

সাহিত্য ও সমাজের নিবিড় সম্পর্ক এবং গভীর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সমাজবিজ্ঞানের নবীনতম শাখা– 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব'। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে; সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সমালোচকদের হাতে এর বিকাশ। সমাজতত্ত্ব মূলত সাহিত্য ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে নির্দেশ করে। যে কোনো মহৎ শিল্পীর সৃষ্টিকর্মে প্রতিচিত্রিত হয় সময় ও সমাজের মৌল প্রবণতাসমূহ। সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র হিসেবে কবিতাকে নির্বাচন করলে দেখা যায় কবির মানস-প্রকর্ষের উৎস সমকালীন সমাজ। কবিতা কী এবং কবিতা কতটা ধারণ করতে পারে– এসব বিষয়ে শিল্পতাত্ত্বিকগণ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। কবিতা তত্ত্ব নয়, কবিও সমাজতাত্ত্বিক নন, তবে যেহেতু কবি জীবনাভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাঁর সমাজ-রাষ্ট্রীয় প্রতিবেশ থেকে, ফলে কবির মানসপ্রসূত কবিতাকর্মও সমাজবিবিক্ত কোনো উন্মূল বিষয় নয়। দ্বন্দ্বমুখর পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে পাশ কাটিয়ে কবির পক্ষে নির্মোহভাবে সমাজ-নিরপেক্ষ কাব্যচর্চা করা প্রায় অসম্ভব। কবিতা কেবল বিমূর্ত সৌন্দর্যসন্ধানী নয়, শক্তিশালী শিল্পউৎস হিসেবে কবিতায় বিন্যস্ত হয় সমাজের বহুমুখী সংকটের প্রতিচ্ছায়া: 'সমাজ-বিকাশে এমন এক সময় আসে যখন শিল্পীকে সৈনিক হতে হয়।'[১] কবির জীবন ও মানসগঠন সম্পন্ন হয় দেশ-কালের প্রত্যক্ষ প্রভাবে, সচেতন অনুশীলনে অথবা অবচেতনে সমাজ-রাষ্ট্রের নানা ঘটনা ও অনুষঙ্গ সক্রিয় থাকে কবির চেতনায়, কবিতার অন্তর্বয়ানে থেকে যায় তার প্রভাব, এজন্য 'সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক একান্তভাবেই সমাজ-বিকাশের মৌল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। সাহিত্যের পাতায় উৎকীর্ণ হয় নির্দিষ্ট কোন কালের বৈশিষ্ট্য, বিশেষ কোন সমাজের বহুমাত্রিক পরিচয়।'[২] বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের (১৯৩৬-২০১৯) *সোনালী কাবিন* (১৯৭৩)[৩] কাব্য আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাত-জারিত। এ কাব্যের কবিতাসমূহের বহুমাত্রিকতা নান্দনিকবোধে শাণিত এবং সমাজতাত্ত্বিক উপাদানে সমৃদ্ধ। *সোনালী কাবিন* কাব্য অবলম্বনে কবিতার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুসন্ধান বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

উনিশ শতক থেকে আধুনিক কাব্যচর্চার পাশাপাশি কাব্য-সমালোচনার যে ধারা ক্রমে বিকশিত হতে শুরু করে সেখানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাব্য-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দেশবিভাগোত্তর কাব্যধারায় হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন সমাজ-সচেতন কবি, তিনি কাব্যের অমরত্বের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন সমাজতত্ত্বকে:

> সার্থক কাব্যের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি সাংস্কৃতিক প্রয়াস সমাজ-আলোড়নেরই শ্রেষ্ঠতম নির্যাস এবং কাব্যই হল সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের সার্থকতম ফলশ্রুতি। সুতরাং কাব্যের অবিনশ্বরতার পেছনে যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা ও অচিন্ত্য অলৌকিকতা বিদ্যমান নয়, এর পেছনে-যে পুরোপুরিই সমাজতাত্ত্বিক সংবেদনাই ক্রিয়াশীল, সে বিষয়ে সম্ভবত সন্দেহমুক্ত হওয়াই অধিকতর সমীচীন মনে হয়।[৪]

বাংলাদেশের কাব্যসমালোচনায় সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সে-অর্থে দেখা যায় না, আল মাহমুদের কবিতার সমাজতত্ত্ব নিয়েও পূর্ণাঙ্গ কোনো কাজ হয়নি, তবে তাঁর কাব্যের অন্যান্য বিষয় নিয়ে সমালোচনা-গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন* (১৯৯৪) শিরোনামের গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত প্রবন্ধসমূহের দুটি প্রবন্ধে আল মাহমুদের কবিতার প্রসঙ্গ এসেছে। প্রবন্ধদ্বয়ে পঞ্চাশের অন্যান্য কবির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার পাশাপাশি আল মাহমুদের কবিতার গ্রামীণ নিসর্গ, চিত্রকল্প ও আল মাহমুদের ওপর আইরিশ কবি ইয়েটসের প্রভাব এবং ইতিহাস-লোকবিশ্বাস-নৃতত্ত্ব-রাজনীতির

আলোকে এ কাব্যের প্রেম ও বিপ্লবী ভাবনা, ভাষা ও শব্দসম্ভার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রফিকউল্লাহ খানের *বাংলাদেশের কবিতা: সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর* (২০০২) গ্রন্থে আল মাহমুদের কাব্যের লৌকিক জীবন, নারী, প্রকৃতি-বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। আল মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ওপার বাংলা থেকে *মাসিক কৃত্তিবাস* 'কবি আল মাহমুদ বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ করে। এখানে আল মাহমুদের জীবন, কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে জ্যোতির্ময় ঘোষ, সুবোধ সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শিবনারায়ণ রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, উৎপল কুমার বসুসহ অনেক গুণীজনের আলোচনা সংকলিত হয়েছে। মোহাম্মদ আজমের *কবি ও কবিতার সন্ধানে* (২০২০) গ্রন্থের 'সোনালি কাবিন' সনেটগুচ্ছ ও আল মাহমুদের কাব্যিক প্রকল্প' শিরোনামের প্রবন্ধটি ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাম্যবাদী চেতনা, নর-নারীর সম্পর্কশাস্ত্রের সূত্রানুসন্ধানে স্বতন্ত্র পাঠ হাজির করেছে। ড. ফজলুল হক তুহিন *আল মাহমুদের কবিতা : বিষয় ও শিল্পরূপ* (২০১৪) শিরোনামের গ্রন্থে দেশ-কাল-রাজনীতি, নারীর পাশাপাশি কাব্যরূপ এবং সমাজবোধ নিয়ে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ছাড়াও পত্র-পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনে আল মাহমুদের কবিতা নিয়ে চর্চা দেখা যায়। *সারেঙ* 'আল মাহমুদ বিশেষ সংখ্যা' (২০২২) এবং আল মাহমুদের ৮৮তম জন্মবার্ষিকীতে 'তারুণ্যের মননে আল মাহমুদ' সংখ্যা (২০২৪) প্রকাশিত হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত এপার-বাংলা ওপার-বাংলার গবেষক ও সমালোচকদের লেখায় আল মাহমুদ চর্চিত হয়েছেন, তাঁর বেশ কিছু লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে। এসব চর্চায় আল মাহমুদের কবিতার সমাজতত্ত্ব বিষয়ক কোনো আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। পঞ্চাশের দশক বাংলা কবিতার বিনির্মাণের কাল, এ সময় যেসব কবি কাব্যচর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে আল মাহমুদ নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কিন্তু, তাঁর *সোনালী কাবিন* নিয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা সম্পন্ন হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধটিতে আল মাহমুদের কবিতার সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্য অনুসন্ধানে ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

আল মাহমুদের *সোনালী কাবিনে* বিলীয়মান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণ ও শিকড়ে প্রত্যাবর্তনের মানবিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাচীন কৌম সমাজব্যবস্থার অভিসম্বন্ধকে ব্যবহার করে তিনি গ্রামীণ জনজীবন, তাদের সামাজিক সম্পর্কের ধরনগুলো নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। সাম্যবাদী সমাজের রূপরেখা তৈরিতে তিনি ইতিহাস থেকে যেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন সেগুলোর কাব্যমূল্য যেমন রয়েছে তেমনি এসব কাব্য-উপকরণের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় সমাজের বর্গীকরণ, ফসলের বণ্টনজনিত বৈষম্য ও মার্কসবাদের সৃজনশীল বিনির্মাণের মূল্যবান সূত্র। অর্থনীতি বলতে তিনি কৃষিজ উৎপাদন ও উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত পেশা এবং স্থানীয় পেশাগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন। যন্ত্রশাসিত নগরে বিকশিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাইরে স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ ও বণ্টনব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তাঁর কবিতায় আবিষ্কার করা সম্ভব। লোকঐতিহ্য ও সংস্কৃতি স্থানভেদে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে, তাঁর কাব্যের বিষয় ও ভাষায় প্রযুক্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যে রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে তার স্থানিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। প্রাকৃত জীবনচর্যার সঙ্গে মিশে থাকা এসব সমাজতাত্ত্বিক উপকরণ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তৈরি ও বি-উপনিবেশায়নের ক্ষেত্রেও রাখতে পারে কার্যকর ভূমিকা।

আল মাহমুদ কবি হবার যে বাসনা ভেতরে ভেতরে লালন করতেন, জীবনানন্দ দাশের *মহাপৃথিবী*র সংস্পর্শে এসে তাঁর সেই কবিসত্তা আত্মপ্রকাশ করে। জীবনানন্দের অনুপ্রেরণা এবং জসীম উদ্‌দীনের প্রভাব অনেকে তাঁর কবিতায় খুঁজে পেলেও নারী, নিসর্গ এবং গ্রামীণ লোকায়ত জীবন-পটে তাঁর কবিতা কতটা মৌলিক সে স্বকীয়তাকে তিনি নিজেই চিহ্নিত করেছেন এভাবে:

> জসীম উদ্‌দীনের বিষয়বস্তুর সাথে আমার কোনো পরিচয় নেই। এমনকি আমি জীবনানন্দ দাশের কাব্যে সামান্য অভিভূত হলেও আমি নিশ্চিতভাবেই জানতাম আমি যে বাংলাদেশের কথা বলতে চাই, সেটা শুধু আমারই বাংলাদেশ। সে বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়।[৫]

'আমারই বাংলাদেশ' বলে যাকে কবি চিহ্নিত করেছেন, *সোনালী কাবিন* কাব্যগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় সেই বাংলার পরিচয় ও নির্মাণ। এ কাব্যের বেশিরভাগ কবিতাই গ্রামের প্রেক্ষাপটে, গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি কবির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজ-ইতিহাসে সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রান্তিক হিসেবে অবস্থানরত গ্রামীণ জনমানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর সংযুক্তি বিস্ময়কর, সেইসঙ্গে বিস্ময়কর তাঁর দেখার এবং দেখানোর চোখ। চোখ তাঁর সবচেয়ে জাগ্রত ইন্দ্রিয়; তিনি যতটা গভীরে দেখতে পান, কেবল কবিতার উত্তরাধিকার বা পাঠলব্ধ জ্ঞান কাউকে এতটা গভীরে টানতে পারে না, এর জন্য প্রয়োজন হয় পরিচয়ের প্রত্যক্ষতা, যে পরিচয় জীবনানন্দের ছিল বরিশাল- সূত্রে, জসীম উদদ্‌ীনের ছিল লোকসাহিত্য সংগ্রহের সূত্রে; আল মাহমুদ অর্জন করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, বাংলার কেন্দ্রে ও প্রান্তে, সমতল ও পাহাড়ে দীর্ঘ সময় যাপন ও সেখানকার জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়-সূত্রে। চাচা-চাচি, ফুফু-ফুফার সুবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাইরে নিবিড় গ্রাম ও পাহাড়ি আদিবাসী জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়, এই জীবনাভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর কবিতার পাথেয় হয়েছে। জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছিল মফস্বল শহরের চারিত্র্য, চাচা-চাচির সঙ্গে কুমিল্লার জগৎপুরে এসে পেলেন নিবিড় গ্রামের স্বাদ। প্রকৃতির সান্নিধ্যে, নদী-হাওর-বিলে, হাটে-ঘাটে-মাঠে খুঁজে পেয়েছিলেন আদিম জনজীবনের সূত্র: 'জগৎপুর এসে বুঝলাম বাংলাদেশের অকপট গ্রামজীবন ও গ্রামসভ্যতার হাজার হাজার বছরের অতীত উপাদান, আদান-প্রদান ও মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ সূত্রগুলো আদতে কী রকম ছিল।'[৬] তিনি ফুফু-ফুফার সাথে তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের পাহাড়ি অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে শেকড়ের আরও কাছে গিয়ে পড়েছিলেন। কুলি-কামিনদের আদিম রক্তধারা ও তাদের সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে তাঁর নতুন কবিজীবনের আদর্শকে একাত্ম করে উপলব্ধি করেছিলেন: 'কবিদের কাজও কুলিদের মতোই। উভয়েই চায় খারাপ জিনিস থেকে বেছে যা কিছু কচি ও কোমল তা আলাদা করে ফেলতে। কুলিরা কচি পাতা বাছে। আমরা কোমল শব্দ বাছি।'[৭] এভাবেই কেন্দ্রে-প্রান্তে, পাহাড়ে-সমতলে বয়ে যাওয়া জীবনের নিভৃততম স্রোতধারার সঙ্গে মিলেমিশে তৈরি হয়েছে আল মাহমুদের কবিসত্তা। যে-বাংলাকে তিনি অবলোকন করেছেন, জীবনানন্দের বাংলা বা জসীম উদ্‌দীনের বাংলার সঙ্গে সে-বাংলা দৃশ্যত একই হলেও উপলব্ধিগতভাবে স্বতন্ত্র। তিনি বাংলার গ্রামকে বিশেষ অর্থে তাৎপর্যমণ্ডিত করতে চান, এই অর্থতাৎপর্যকে প্রসারিত করতে চান বিশ্বব্যাপী, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যাবতীয় গ্রামকে বিপ্লবের মন্ত্রে বাঁধতে চান একসুতোয়: 'গ্রাম বলতে আমি যূথবদ্ধ আদিম মানব জীবনকে বুঝি না বরং এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় যেসব নরনারী ধনতান্ত্রিক নগরসভ্যতার বিরুদ্ধে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলেছেন তাঁরা আসলে গ্রামেরই লোক।'[৮] আল মাহমুদের গ্রাম কেবল নিসর্গের স্বর্গভূমি নয়, বরং প্রতি-ইতিহাসের কেন্দ্রভূমি। আত্মপরিচয় নির্ণয়ের পাশাপাশি গ্রামের আদিম জনস্রোতে জাতিসত্তার শেকড়সন্ধান করে গ্রামকে তিনি ফিরিয়ে দিতে চান সমাজ ও সভ্যতার আদিভূমির

মর্যাদা। এজন্য তিনি ফিরেছেন লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির কাছে। জীবনানন্দ দাশসহ আরো অনেক কবির মতো তাঁর কবিতাতেও ব্যবহৃত হয়েছে প্রাক-বৈদিক পর্বের দেবী মনসা ও বেহুলা-লখিন্দরের প্রসঙ্গ। কিন্তু তিনি কেবল চরিত্র হিসেবে লোকপুরাণ থেকে তাদের সংগ্রহ করে ক্ষান্ত হননি, ক্লান্তিহীন তৎপরতায় পুরাণকে করেছেন কেন্দ্রমুখী, তার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন পুণ্ড্র, করতোয়া, পাট্টিকেরার সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিচয়, 'ভাটির কুমার' বলে নিজেকে করেছেন চিরায়ত ইতিহাসের অংশী। ইতিহাসের প্রান্তবাহী ইঙ্গিতসমূহকে সংযুক্ত করে তিনি প্রথমে ব্যক্তিপরিচয় সুনির্দিষ্ট করেন, তারপর নির্মাণ করেন জাতিসত্তার পরিচয়। নানা সময়ে বাংলার সমাজ-রাষ্ট্রে বিভিন্ন শক্তির আগ্রাসন যে বিচ্ছেদ ও ব্যবধান তৈরি করেছিল, সেই বিভেদ ঘুচিয়ে একতার কথা বলতে চান, ছড়িয়ে দিতে চান সাম্যের বাণী।

আল মাহমুদ *সোনালী কাবিনের* পটভূমিতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাশপাশি সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৃহত্তর গ্রামবাংলা ও জনজীবনকে নির্বাচন করেছেন। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জ্ঞানপুষ্ট ভারতীয় সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গ্রাম এবং শহরের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ছিল না, ফলে উনিশ শতকের আলোকচ্ছটা শহর পেরিয়ে গ্রামে পৌঁছাতে পারেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো ভূমিব্যবস্থাপনা, অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্কার, ঔপনিবেশিক শক্তির অনুগত ভূস্বামীগোষ্ঠী তৈরি এবং মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণি সৃষ্টি– এসবই গ্রামীণ কৃষিপ্রধান অর্থনীতির ছিল জন্য হুমকিস্বরূপ, অন্যদিকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অবস্থানও ছিল দূরবর্তী। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় গ্রামীণ জনজীবন ও অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের সংবাদ কিছুটা পাওয়া গেলেও মূলধারার কবিতায় গ্রাম ও নগরের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ধরা পড়েনি, তবে বিপ্লবী কবির হাতে কখনো কখনো শিকড়সন্ধানী উচ্চারণ বাণীরূপ পেয়েছে:

> ডাক ওঠে শহরে শহরে।
> রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে;
> মাঠের ফসল দিন গোনে।[৯]

ত্রিশের আধুনিক কবিতায় গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির চর্চা ছিল সীমিত গণ্ডীতে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক, অনেক সময় রবীন্দ্র-বিরোধীতা থেকে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়াসে কবিতা নির্মাণের উপকরণ মাত্র:

> তিরিশ, চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশক জুড়ে কবিতায় যে জীবন ও মানুষ ছিলো অনাদৃত, শিল্প এবং বিষয়ের প্রয়োজনে অবশ্য কখনো কখনো পেছন ফিরে তাকিয়েছেন কোনো কোনো কবি, কিন্তু জীবনবোধ সেখানে ছিলো কুয়াশাবৃত্ত।[১০]

আল মাহমুদ সেই 'অনাদৃত' 'কুয়াশাবৃত্ত' জীবনবোধের রূপকার, তাঁর শ্রেণিসচেতন কবিচৈতন্যে তিনি ধারণ করেছেন গ্রামীণ মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার অকৃত্রিম রূপ। তিরিশের যেসব কবি কবিতায় লোকজ উপাদান ব্যবহার করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন জসীম উদ্‌দীন, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে প্রমুখ। সে সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তুলনায় বিপ্লবী কবিদের কাছে প্রান্তীয় জনগণের অধিকার রক্ষার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল, কারণ 'দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে দেশবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টির অবিচ্ছিন্নতাও তাঁরা অনুভব করেছিলেন আরো প্রত্যক্ষভাবে।'[১১] বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মধারা ও কবিতাধারায় গ্রামীণ সমাজ ও নিম্নবর্গের মানুষের জীবনসংগ্রাম এবং সংস্কৃতি অনেকটা জায়গা দখল করে নিতে পেরেছিল। আল মাহমুদ জীবনের

প্রথম পর্যায়ে এই বিপ্লবী কাব্যধারার উত্তরাধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন: 'প্রাথমিক পরিচয়ের পর আল মাহমুদ সাম্যবাদী কবি-লেখক-শিল্পীদের সংস্পর্শে আসেন নিবিড়ভাবে।...ঢাকাকেন্দ্রিক সাম্যবাদী সাহিত্যাঙ্গন এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আল মাহমুদ নিজেকে একজন মার্কসবাদে দীক্ষিত কবিরূপে গড়ে তোলেন।'[১২] এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লালমোহন পাঠাগার, বিপ্লবী নারী শোভার সঙ্গে কবির বন্ধুত্ব, বিপ্লবী কমরেডদের সঙ্গে পরিচয় ও সহযোগিতার সূত্রে কিশোর বয়সেই মার্কসবাদী চেতনার সঙ্গে আল মাহমুদের পরিচিতি ঘটেছিল:

> 'লালমোহন পাঠাগারের সাথে বেশ ভালোভাবেই জড়িয়ে গেলাম আমি। জড়িয়ে গেলাম এদের রাজনৈতিক আদর্শের সাথেও। বুঝে হোক না বুঝে হোক আমি মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার ভেতর সমাজটাকে পাল্টে ফেলার একটা রঙিন স্বপ্নের দিকে ডানা মেলে দিলাম।'[১৩]

বিপ্লবী কর্মী বা মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না হয়েও মার্কসবাদের ওপরে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যিক প্রকল্পটি আল মাহমুদের হাতেই ফলবান হয়েছে: 'বাংলা কবিতায় চল্লিশের দশকে যে মার্কসীয় চেতনাদীপ্ত কাব্যধারা সুকান্ত-সুভাষ-মঙ্গলাচরণের কবিতায় শুরু, 'সোনালী কাবিন' সম্ভবত সেই ধারার শ্রেষ্ঠ ফসল। কৌতূহলজনক বলে যা একদিন চিহ্নিত হবে তা হচ্ছে, আল মাহমুদের মত মার্কসবাদে 'অদীক্ষিত' কবির হাতেই এ ধারার শ্রেষ্ঠতম কবিতাটি রচিত হল।'[১৪] যে অর্থে আল মাহমুদকে সমালোচক 'অদীক্ষিত' কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সেই অর্থে মার্কসবাদে যান্ত্রিক দীক্ষালাভের বিষয়টিকে খারিজ করে দিয়েছেন বিষ্ণু দে: 'যাঁরা মার্কসবাদে শুধু কর্মীর স্থান আছে বলে মনে করেন, সাহিত্য ও শিল্পকে গৌণ জ্ঞান করেন, তাঁরাও মার্কসবাদে সম্যক দীক্ষালাভ করেননি।'[১৫]

আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় প্রান্তিক মানুষের জীবনভাবনাকে রূপ দিয়েছেন তাদেরই ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির সূত্র ধরে। ইতিহাস-ঐতিহ্য বা বর্তমানের কোথায় আলো ফেলবেন একজন কবি, আলো জ্বেলে তিনি কোথায় অবস্থান নেবেন– এটি নির্ভর করে অনেকাংশে কবির ব্যক্তিক অভিরুচির ওপরে, অনেকাংশে জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার আকাঙ্ক্ষার ঐকান্তিকতার ওপরে। জীবন-জীবিকা ও শিল্পের দায় মেটাতে আল মাহমুদ শহরমুখী হয়েছিলেন, নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবন উভয় ক্ষেত্রের নানা অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পুঁজিবাদের আগ্রাসনের মুখে বিপন্ন কৃষি উৎপাদন ও কৃষিসংস্কৃতির ভেতরে খুঁজে পাওয়া সম্ভব জাতিসত্তা বিকাশের মৌলিক সূত্র। তাঁর চোখে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং আধিপত্যবাদের সূত্রটি : '...গ্রাম-শহরের দ্বৈত, একতরফা সম্পর্কই আজ প্রতিফলিত উন্নত বিশ্ব ও অনুন্নত বিশ্বের সম্পর্কে– গ্রামীণ তৃতীয় বিশ্ব আজ সব দিক থেকেই অধীন নাগরিক প্রথম বিশ্বের।'[১৬] পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের নগর ও গ্রামের মতো ভারতবর্ষেও ধনবণ্টনে এবং ক্ষমতা-কাঠামোয় নগরবাসী অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। প্রাচীন নগরীর চারিত্র্যও ছিল আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার নগরের প্রতিরূপ। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বিকশিত সওদাগরী ধনতন্ত্র, রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিকদের অবস্থান ও প্রভাব এবং কৃষিজীবী গ্রামীণ মানুষের প্রান্তিকীকরণের ঐতিহাসিক চিত্রও ছিল বৈষম্যমূলক। ইতিহাসের অন্তরালে চাপা পড়ে গিয়েছিল সাধারণ কৃষিজীবী জনজীবন, সওদাগরী ধনতন্ত্রের আধিপত্য ছিল প্রবল:

> 'সামাজিক ধন উৎপাদন ও বণ্টনের সাধারণ নিয়মে রাষ্ট্র যেমন ইহাদের পোষক ও সমর্থক, ইহারাও তেমনি রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমর্থক। ...কৃষি ও সাধারণ গৃহস্থ-সমাজ তো নিশ্চয়ই ছিল, ভূমি মাপ-জোখ, পট্টোলী-রেজিস্ট্রির সাক্ষী ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহারা স্থানীয় অধিকরণের সাহায্যও করিতেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে তাঁহাদের প্রাধান্য তো নাই-ই, স্থানও নাই।'[১৭]

পুঁজিবাদী সমাজের যে আধিপত্যবাদী চারিত্র্য তার ভ্রূণ উপ্ত হয়েছিল উপনিবেশপূর্ব কালে সওদাগরী ধনতন্ত্রের ভেতরে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আধুনিককালে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত নগরের সঙ্গে নতুন করে কৃষিজীবী গ্রামের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে। আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় একাধিকবার নগরের বিরুদ্ধে গ্রামকে দাঁড় করিয়ে দেন, আপাতদৃষ্টিতে এটিকে বিরোধ মনে হলেও তিনি আবহমানকালের বর্গীকরণ ও বিচ্ছেদের মূলোৎপাটন করে পুঁজিবাদী নগর ও কৃষিজীবী গ্রামের আর্থ-সামাজিক সমতা ও সাংস্কৃতিক সাম্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চান:

> মনে হলো, ডাক দিলে জড়ো হয়ে যাবে সব নদীর মানুষ
> অসংখ্য নাওয়ের বাদাম মুহূর্তে গুটিয়ে ফেলে রেখে
> জমা হয়ে যাবে এই চরের ওপর।
> ক্ষেতের আড়াল থেকে কালো
> মানুষের ধারা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে
> কীভাবে এগোবে তারা দুর্ভেদ্য নগর তোরণে প্রথম।[১৮]

গ্রামীণ মানুষদের ভূমিকেন্দ্রিক শ্রমনির্ভর জীবন ও সংস্কৃতির মৌলিকতা বিনষ্ট করতে পারেনি উপনিবেশ বা পুঁজিবাদ। এজন্য তাদের 'শুদ্ধ' মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে আত্মবিস্মৃত, শিকড়চ্যুত নগরের প্রতিপক্ষে দাঁড় করান:

> যেমন আমি ভাবি, গ্রাম থেকে শুদ্ধ মানুষের স্রোত এসে
> একদিন শহর দখল করে নেবে।[১৯]

কবিতায় তিনি আরও জানাচ্ছেন:

> যে অতর্কিতে
> শহরগুলোকে দখল করা হবে
> আমার মুখ তারি রক্তাক্ত পরিকল্পনা।[২০]

যৌথতার অঙ্গীকার আল মাহমুদের কবিতার একটি মৌলিক প্রত্যয়, তাঁর শ্রেণি-জোটে অংশ নেয়া মানুষেরা 'নদীর মানুষ', 'কালো মানুষ', গ্রামীণ 'শুদ্ধ' মানুষ। তাঁর কবিতায় নগরের প্রতি যে বিরোধিতা সেটি প্রতীকী, গ্রাম মানে যেমন তাঁর কাছে কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, বরং চেতনাগত বিস্তৃতি, একইভাবে নগরও কোনো ভূগোলের বিবরণ নয়, বরং পুঁজি ও আধিপত্যের প্রতীক, আত্মবিস্মৃতির প্রতীক। নগরের বিরুদ্ধে গ্রামের উত্থান কেন্দ্র ও প্রান্তের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে:

> আল মাহমুদ নগরকে এড়াতে চান না, কিন্তু নগরে যে ঐতিহ্যচ্যুতি ঘটেছে, গণমানুষের স্বভাব এবং যাপনপদ্ধতির অস্বীকৃতি ঘটেছে, তিনি তার নিরাকরণ চান। সেজন্য তিনি গ্রামকে অবলম্বন করেন। কারণ, গ্রামীণ বাস্তবতার মধ্যেই 'আসল' ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা আবিষ্কার সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।[২১]

ধনতন্ত্রের বাহকেরা এই 'আসল' সম্পর্কে জানে বলেই 'আসল'কে নিশানা করে তাকে নিশ্চিহ্ন করাটাও তাদের প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ:

> হাজার হাজার বছরের কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে যেসব ভাবধারা সজ্জিত হয়েছে তাদের মধ্যে কোনো কোনো ভাবধারায় রয়েছে চিরন্তন মূল্য। সেগুলি বিনষ্ট হবে না, হওয়া উচিতও নয়।

> বুর্জোয়া তথা ধনতন্ত্রের ধারক-বাহকেরা তাদের রাজত্বে যে অধঃপতন এনেছে, তার একটি লক্ষণ হচ্ছে এইসব মূল্যবোধকে চেতনা থেকে মুছে দেয়া।[২২]

এক্ষেত্রে একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো হীনম্মন্যতার রাজনীতি, যে হীনম্মন্যতা প্রথম ছড়িয়েছিল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বৈদিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যবহার করে, কৌম সমাজব্যবস্থার ভাঙনের পেছনে যেটি অন্যতম একটি কারণ। আর্যসংস্কৃতিতে কৌমসমাজের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা বা প্রীতির নিদর্শন ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* কোমের উল্লেখ থাকলেও এগুলোকে 'দস্যু' কোম নামে অভিহিত করা হয়েছে। যে পুণ্ড্রনগরীকে জাতিসত্তা অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ ঐহিতাসিক উপাদান হিসেবে কবিতায় ব্যবহার করেছেন আল মাহমুদ, সেই পুণ্ড্রকোমও ছিল দস্যুকোমের অন্তর্ভুক্ত। মনু এ কোমের অধিবাসীদের 'ব্রাত্য' বলে অভিহিত করেছিলেন, যেহেতু তাদের ব্রত-আচার ছিল বৈদিক সংস্কৃতি-বহির্ভূত। *মহাভারতে* পুণ্ড্রদেরকে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দেয়া হয় এবং করতোয়া তীরস্থ পুণ্ড্রকে তীর্থের মর্যাদা দেয়া হয়– সেটি ছিল আর্যীকরণের প্রয়োজনে আপোসের নমুনা। প্রথমদিকে পূর্ব-ভারতের কোমগুলো ছিল আর্য আধিপত্যের বাইরে, এজন্য 'বিভেদের বৈদিক আগুন/ করতোয়া পার হয়ে এক কঞ্চি এগোতো না আর,'[২৩]। কোমভুক্ত জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান, ব্রত-আচার, এমনকি তাদের ভাষার প্রতিও ছিল বৈদিকদের অবজ্ঞা, কোমের ভাষাকে তারা জানত 'অসুর ভাষা' হিসেবে। পরবর্তীকালে উর্বর শস্যক্ষেত্র, নদীতীরশায়ী বাস্তু এবং সর্বোপরি 'আদিমতম কোমবৃন্দের উপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা'য়[২৪] পূর্ব-ভারতের কোম-শাসিত ভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করে আর্যরা। আর্যীকরণের বিরুদ্ধে অনার্য জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ ছিল, কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সে প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে, সমন্বয়ের নামে আর্যীকরণের অধিভুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য হারাতে থাকে কৌম সমাজ:

> প্রাথমিক পরাভব ও যোগাযোগের পর এই সব পূর্বদেশীয় কোমগুলি ক্রমশ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি এবং আর্য সমাজ-ব্যবস্থার একপ্রান্তের স্থানলাভ করিতে আরম্ভ করিল।...রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটিয়াছিল আগে; সংস্কৃতির পরাভব ঘটিয়াছে অনেক পরে।[২৫]

যে হীনম্মন্যতার রাজনীতি ও বিভেদ বাঙালির আর্যীকরণের ক্ষেত্রে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, ইংরেজ উপনিবেশে ঘটেছিল তার ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি– সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ববাদ ও ভাগ করে শাসন করো নীতির মাধ্যমে। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-ইতিহাস-সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে উপনিবেশিতদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য হরণের যে প্রক্রিয়া, সেই সাংস্কৃতিক বর্ণবাদের বাহক হিসেবে তারা এদেশের জনগোষ্ঠীকেই ব্যবহার করেছে। ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের আগ্রাসনই বাঙালিকে পরিণত করেছে আত্মবিস্মৃত জাতিতে :

> পশ্চিমের ভাব ও জ্ঞান যতটাই জায়গা দখল করতে থাকে, ততটাই হারিয়ে যেতে থাকে আমাদের সংস্কৃতিজাত জ্ঞানজগৎ। উপনিবেশায়নের প্রভাবে সৃষ্ট এই স্মৃতিবিলোপ প্রাক-ঔপনিবেশিক ভাবজগৎকে এমনভাবে আড়াল করে রাখে, যেন তার অস্তিত্বই ছিল না।[২৬]

আল মাহমুদ খুব সচেতনভাবে উপনিবেশপূর্ব সেই বিস্মৃত সময়পর্বের ওপর আলোকপাত করেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে উপনিবেশ থেকে মুক্ত হবার পরেও উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া অদৃশ্যভাবে মূল্যবোধ আকারে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে সক্রিয় থাকতে পারে, *সোনালী কাবিনের* কবি হিসেবে আল মাহমুদের অবস্থান উপনিবেশিত সময়সীমার বাইরে উপনিবেশগ্রস্তদের বিরুদ্ধে:

> পোকায় ধরেছে আজ এদেশের ললিত বিবেকে
> মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পণ্ডিত সমাজ।[২৭]

ইউরোপ-প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় লালিত পণ্ডিত সমাজকেই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করে উপনিবেশের ভূত, 'বিদ্যালয়ে কেশে ওঠে গুটিকয় সিনানথ্রোপাস'[২৮]– বলে চেতনা ও মূল্যবোধ-বিসর্জিত বিদ্যায়তনিক পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদের কথাই বলতে চান কবি। বর্তমানের অবস্থা যখন এমন সংকটাপন্ন তখন প্রাচ্য-জ্ঞানচর্চার ইতিহাস বলতে অবশিষ্ট থাকে শ্রীজ্ঞান, শীলভদ্রের কাল: 'অতীতকে বাদ দিলে আজ তার কোনো কিছু নেই'।[২৯] তবে অতীতও সবসময় নিষ্কলুষ ছিল না সেটি ধরা পড়ে আলাওলের প্রসঙ্গে। মেধা ও প্রতিভার বাণিজ্যিকীকরণের তালিকায় যুক্ত হয় মধ্যযুগের এই কবির নাম। পুঁজিবাদ ও ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ, বিশেষ করে যেখানে শিল্পী বশ্যতা স্বীকার করেন না। আল মাহমুদের 'মস্তকের ওপরে শোষকের খাড়া' ঝুলে থাকলেও শিল্পের স্বকীয়তার প্রশ্নে তিনি নির্মাণ করেন লালনের স্বাধীন স্বরের প্রতি-ইতিহাস। কবি 'মাৎস্যন্যায়ে'র বিরোধিতা করেন এবং 'কৌম সমাজে'র উত্তরাধিকার স্বীকার করে নেন নির্দ্বিধায়। আলাওলের ক্ষমতা ও কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য এবং মনোরঞ্জনবৃত্তির তুলনায় লালনের দারিদ্র্যকেই তাঁর কাছে শ্রেয়তর মনে হয়:

> পূর্ব-পুরুষেরা কবে ছিলো কোন সম্রাটের দাস
> বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোয়াড়,
> ...এর চেয়ে ভালো নয় হয়ে যাওয়া দরিদ্র বাউল?[৩০]

সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রয়োজন নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা, তাকে চিহ্নিতকরণ এবং তার প্রতিষ্ঠা। এ কারণে কবি একদিকে নির্বাচন করেন লালন, গৌতম, শ্রীজ্ঞান, শীলভদ্র, চর্যাপদ, খনা ও মঙ্গলকাব্যের কবিদের প্রসঙ্গ, ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের আগ্রাসনের সীমার বাইরে থেকে এসব কাব্য-উপাদান সংগ্রহ করেন। অন্যদিকে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের তালিকায় উঠে আসে ফসল লুণ্ঠনকারী বর্গী, বৈদিক ব্রাহ্মণ, রাজ-সভাকবি আলাওল, অন্তঃসারশূন্য পণ্ডিতদল, অদৃশ্য উপনিবেশী শক্তি এবং কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে*র প্রসঙ্গ। পুরাণ ও ইতিহাস খুঁজে ঔপনিবেশিক সময়সীমার বাইরে থেকে জীবন-সঞ্জীবনী প্রেরণা হিসেবে সংগ্রহ করেন বেহুলাকে, প্রকৃতির প্রাণ-অনুসন্ধানী খনাকে দান করেন কবির মর্যাদা। প্রেমিকা হিসেবে নির্বাচন করেন অনার্য নারীকে, যে শ্যামাঙ্গী কবির মতোই রক্তে বহন করে তাম্রবর্ণ 'কাজল জাতি'র উত্তরাধিকার। প্রেমের কামকলা প্রদর্শনের প্রশ্নেও আল মাহমুদ তাঁর আদর্শিক অবস্থানে অনড়:

> বাঙালি কৌমের কেলি কল্লোলিত করো কলাবতী
> জানতো না যা বাৎসায়ন, আর যত আর্যের যুবতী।[৩১]

আদিম কৌম সমাজে উৎপাদনশীলতার প্রতীক হিসেবে নারীর অবস্থান ছিল মর্যাদাপূর্ণ। নারীকে মহাকালের সাক্ষী হিসেবে হাজির করেন এবং তাকেও দায়বদ্ধ করেন শ্রেণি-বিভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে:

> পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
> এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
> যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।[৩২]

আল মাহমুদ তাঁর বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে নারীকে যুক্ত করেছেন নিবিড়ভাবে। 'তোমার শরীরে যদি থাকে শস্যের সুবাস'[৩৩] অথবা 'তোমার চেয়েও বড় হে শ্যামাঙ্গী, শস্যের বিপদ'[৩৪]– নারীকে কেন্দ্রে রেখে এসব উচ্চারণ প্রমাণ করে কবির আরাধ্য দয়িতা কৃষিসংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

গ্রামপ্রধান বাংলার অর্থনীতির কেন্দ্রে ছিল কৃষি, আল মাহমুদ কৃষকদের পক্ষের মানুষ, ফসল ফলানোকে তিনি শিল্পকর্ম হিসেবে অভিহিত করেন, কৃষকেরা তাঁর কবিতায় 'শস্যের শিল্পী'। উপনিবেশপূর্ব, উপনিবেশায়িত বা উপনিবেশমুক্ত– এই তিন পরিস্থিতিতে বাংলার ভেতরে নানা শ্রেণিভুক্ত মানুষ নিয়ত তাঁর অভিরুচি পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আধুনিক কালখণ্ডে এসে উপনীত হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষক শ্রেণিই সেই আদি-অকৃত্রিম শ্রেণি, উপনিবেশ ও আধুনিকতার নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অদল-বদলের ভেতরেও তাদের নিজস্ব চারিত্র্য রক্ষা করে চলেছে, সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে গ্রামীণ কৃষিজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর প্রতি কবির অগাধ আস্থা, বিপ্লবী বিশ্ব-ইতিহাসই এই আস্থার মূল: 'চীন-ভিয়েতনামের বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই গ্রামের নির্বোধরাই বিপ্লবের নায়ক হতে পারে, উপনিবেশের শৃঙ্খল ভাঙতে পারে। অর্ধবর্বর, মূর্খ গ্রামের চাষীরাই গত তিন-চার দশকের মূল বিপ্লবীশক্তি।'[৩৫] উপনিবেশ ও দেশবিভাগোত্তরকালে অনেক বড় বড় কৃষক-আন্দোলন সংঘটিত হতে দেখা যায় বাংলার নানা প্রান্তে, বৈষম্যের প্রতিবাদ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষেত্রে হাজং, টংক, নানকার এসব কৃষক-আন্দোলনের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী। আল মাহমুদ কৃষিসহ অন্যান্য পেশার গ্রামীণ বিপুল জনগোষ্ঠীকে 'বীরের' তকমা পরিয়েছেন, বিশ্ব-রাজনীতির ইতিহাস ঘুরে শ্রমজীবী শ্রেণির বিপ্লবী উত্থানে জানিয়েছেন আন্তরিক সংহতি:

> শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
> হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
> এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
> তাঁদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।[৩৬]

পুঁজিবাদী সভ্যতা মানুষকে উপড়ে নেয় শিকড় থেকে, করে তোলে পরজীবী। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে এমনকি সৃজনশীল প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়নের প্রত্যাশায় মানুষ প্রান্ত থেকে কেন্দ্রাভিমুখী হয়, তৈরি হয় বিচ্ছিন্নতা, নাগরিক জীবনের নানা সাফল্যও ঢাকাতে পারে না সেই ছিন্ন হবার বেদনাকে। ফলে তৈরি হয় অনুশোচনা, প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা। কবি হবার স্বপ্ন নিয়ে নগরে বসতি গড়ে তোলা আল মাহমুদ প্রতিনিয়ত অনুভব করেছেন শিকড়ের টান। আল মাহমুদ শৈশবে স্বদেশ দেখা শুরু করেছিলেন ঘরের দোরগোড়া থেকে, জন্মগ্রাম মোড়াইলের সঙ্গে, তিতাসের জল ও তৃণভূমির সঙ্গে অতি শৈশবেই তিনি আত্মিকভাবে সম্পৃক্ত হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তিনি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন কবি হবার বাসনায়: 'আমি কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঢাকায় আসিনি। এসেছিলাম শুধু কবি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে।'[৩৭] শিকড়ে ফেরার একটা নীরব প্রস্তুতি সব মানুষেরই থাকে, কবিরা ফিরতে চান আরও তীব্রভাবে। আল মাহমুদেরও ফেরার অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু পেশা ও পরিচয়ের নানা সূত্রে ঢাকা হয়ে উঠেছিল প্রিয় শহর, নাগরিক জীবনের প্রতি আরেক ধরনের টান তাঁর ফেরার প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি, কিন্তু কবিতায় রয়ে গেছে সে আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি। গ্রামের নস্টালজিয়া আর নগরের মাদকতার দ্বৈত-দ্বিধার টান কেবল মাহমুদের একার নয়, শিকড়বিচ্ছিন্ন মানুষের এ এক সাধারণ আর্তি:

> ভুলে যাচ্ছি আমার গ্রামটিকে,
> আমাকে জন্ম দেবার জন্যেই একদিন যার জন্ম হয়েছিল।
> ... আমাকে টেনেছে এই নগর নটিনী।[৩৮]

একবার শিকড় থেকে বিচ্ছেদের পর ফিরতে চাইলেও সবাই ফিরতে পারে না, ট্রেন ধরতে না পেরে বাড়ি ফিরে আসায় যে 'প্রত্যাবর্তনের লজ্জা' সৃষ্টি হয়, 'খড়ের গম্বুজে' তারচেয়ে বড় লজ্জার চিহ্ন থেকে যায়। জীবনানন্দের মতো ফেরার প্রত্যাশা আল মাহমুদেরও ছিল, *কালের কলসে* সে প্রত্যাশা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং *সোনালী কাবিনে* এসে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হলেও তিনি দেখালেন মৌলিক ক্ষতির পরিমাণ। পুঁজিবাদ ও নগরসভ্যতা শিকড়ছিন্ন মানুষকে এমনভাবে নির্মাণ করে যেখানে সামান্য পোশাকও হয়ে ওঠে বিরোধের উপকরণ:

> সোনালী খড়ের স্তূপে বসতে গিয়ে – প্রত্যাগত পুরুষ সে-জন
> কী মুস্কিল দেখলো যে, নগরের নিভাঁজ পোশাক
> খামচে ধরেছে হাঁটু। উরতের পেশী থেকে সোজা
> অতদূর কোমর অবধি
> সম্পূর্ণ যুবক যেনো বন্দী হয়ে আছে এক নির্মম সেলাইয়ে।
> যা কিনা এখন তাকে স্বজনের সাহচর্য, আর দেশের মাটির বুকে, অনায়াসে
> বসতেই দেবে না।[৩৯]

সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষাকবচের কাজ করে, আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধারে ইতিহাসের ভেতর দিয়ে অতীতকে পুনর্নির্মাণের বিকল্প নেই। জাতিসত্তার সংকট-মুহূর্তে ইতিহাসে বারবার তাই ঘটেছে। নানারকম বিভাজনই জাতিসত্তার প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের পরিপন্থী। পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ণবাদ, ভারতের ইতিহাসে বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথা অনেক সময় বিপ্লবী আন্দোলনের অন্তরায় হয়ে উঠেছে। কবি যে-কোনো ভেদনীতি যা বর্গীকরণের কারণ, তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, জেনেছিলেন 'বিভেদের বৈদিক আগুনে' পুড়ে 'ললিত সাম্যের ধ্বনি ব্যর্থ হয়ে যায় বারবার'।[৪০] তিনি বলতে চান প্রান্তবাসী কৃষিশ্রমিকদের কথা, উৎপাদন যারা করে তাদের শ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন নিহিত আছে 'সুষম বণ্টন' প্রক্রিয়ার ভেতরে, কারণ 'উৎপাদনের মতোই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বণ্টন'[৪১], তাই কবির সামাজিক যৌথতার অঙ্গীকার বাণীবদ্ধ হয় 'ফসলের সুষম বণ্টনে'র দাবিতে।

সোনালী কাবিনে গ্রামীণ জনজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত নদীর প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। নদী জলের উৎস, পলির উৎস, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যোগাযোগের প্রাকৃতিক ও প্রাচীন উৎস। নদীমাতৃক বাংলা বলে যে দেশকে আমরা চিহ্নিত করি, সেখানে জলের আধিক্য ভাটি অঞ্চলেই বেশি। নদীর কবি আছেন, নদীর কথক আছেন; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, দেবেশ রায়– নদীর কথক। অন্যদিকে নদীর প্রসঙ্গ যাত্রালগ্ন থেকে বাংলা কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে আত্মীকৃত। প্রিয় নদীর গীতিধ্বনি প্রথম শোনা যায় মাইকেলের কবিতায়, তারপর ঐতিহ্য-পরম্পরায় দেখা যায় প্রত্যেক কবিই বিশেষ কোনো নদীর কাছে ঋণী: 'আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কপোতাক্ষ আছে'।[৪২] আল মাহমুদের কপোতাক্ষ হলো তিতাস নদী। নদী গড়ে, নদী ভাঙে, প্রাকৃতিক এ রীতি পুরোনো, আল মাহমুদের কলমে এই নদী কেবল জলের সঙ্গে ডাঙার দ্বন্দ্ব নয়, সর্বগ্রাসী ভাঙনের প্রতীক:

> মেঘনার জলের কামড়ে
> কাঁপতে থাকে ফসলের আদিগন্ত সবুজ চিৎকার।
> ভাসে ঘর, ঘড়া-কলসী, গরুর গোয়াল
> বুবুর স্নেহের মতো ডুবে যায় ফুল তোলা পুরনো বালিশ।[৪৩]

নদী আবাস গড়ে, নদীর আক্রোশের মুখে মানুষ হয় বাস্তুচ্যুত, ফসলী ভূমি, বাসস্থান এমনকি আসবাবপত্রের সঙ্গে সঙ্গে নদীর আগ্রাসনে হারিয়ে যায় লোকঐতিহ্যের নিবিড় অঙ্গ সুতার কারুকাজের 'ফুলতোলা' বালিশ। যন্ত্রসভ্যতার আধিপত্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নদী তার একাধিপত্য হারিয়েছে। আকাশ ও স্থলপথের দ্রুতগ্রামিতার কাছে পরাজিত হয়েছে বায়ু ও স্রোতের ওপর নির্ভরশীল শ্লথ গতির নদীকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা। কবির প্রিয় নদী তিতাস। তিতাসের অন্ধি-সন্ধি গদ্যে তুলে এনেছিলেন তিতাসবিধৌত ভূমির আরেক সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণ, কবিতায় সেই নদীর প্রভাবকে নির্মাণ করলেন আল মাহমুদ। উৎপাদনের সহযোগী নদীর ভূমিকা ইতিহাসের নানা পর্বে নানা রকম। জড় নদীর গতিপথও জৈবিক সত্তার মতো বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে:

> নিসর্গের মানচিত্র ছেঁদা করে একদা যে নদী
> আনতো গভীর জল কর্মপরায়ণ ঘরে ঘরে
> সে আজ নদী নয়, কালসাপ, ধূর্ত বণিকের
> গোপন দালাল যেন।[৪৪]

আদিম সভ্যতার পত্তন সবসময় হয়েছে নদীমাতৃক ভূমিতে। করতোয়ার তীরে ছিল পুণ্ড্র, গোমতীর তীরে ছিল পাট্টিকেরা, ঢাকা ব্রহ্মপুত্রের তীরে, জব চার্নক কলকাতার সুতানুটিতে কলকাতা শহর পত্তন এবং উপনিবেশের জাল বিস্তারে নদীর ভূমিকা মাথায় রেখেছিলেন। কবি নিজের উত্তরাধিকার নির্মাণ করেছেন নদীমাতৃক বাংলার ভাটি অঞ্চলের ভৌগোলিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে।

কবি মাত্রই নতুন ভাবকে বিন্যস্ত করতে খুঁজে ফেরেন নতুন ভাষা। *সোনালী কাবিন* কাব্যের বহুমাত্রিক ভাষ্যের সমন্বয় সাধনের জন্য আল মাহমুদের অন্বিষ্ট ছিল একটি বিশেষ ধরনের সময়পট এবং বিশেষ ধরনের ভাষা। ইতিহাস ঘুরে তিনি কৌম সমাজে স্থিত হয়ে খুঁজে পেলেন তাঁর স্বাপ্নিক প্রকল্প নির্মাণের অনুকূল আর্থ-সমাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, ভাষা তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন নিজের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে। তিরিশের দশকে কাব্যচর্চায় লোকঐতিহ্য ও দেশজতাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন বিষ্ণু দে। তিনি কবিতার ভাষা অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছিলেন:

> ...দেশজ নাচে গাঁথো ভাষা।
> রেখো না বিলাসী কোনো আশা,
> নববাবু ভাষা ছাড়ো মন।[৪৫]

তিরিশি কাব্যভাষার জীর্ণ উত্তরাধিকারের পরিবর্তে গ্রামীণ ঐতিহ্য, লোকজ আচার-প্রথা, কৃষি-সংস্কৃতিজাত শব্দাবলির সমন্বয়ে আল মাহমুদ যে স্বতন্ত্র কাব্যভাষা বিনির্মাণ করেন, সেই ভাষার নিজস্বতার শক্তিতে তাঁর কবিতা ধারণ করে আছে লোকসমাজের জীবনবাস্তবতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক স্বাধীকার, দেশ-কাল, নারী-প্রেম-প্রকৃতির মতো বিচিত্র বিষয়কে। 'আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন'[৪৬]– এ উচ্চারণ যেমন হৃদয়কে রোমান্টিক গীতিকবিতার ভাবাবেগে আন্দোলিত করে, তেমনি ঘোষণা করে শ্রেণিব্যবধান ও শ্রেণিশোষণের পরিসমাপ্তি। এ বাক্য যে আবহ তৈরি করে, গদ্যে তা অসম্ভব। শুধু গদ্যে নয়, অন্যান্য বিপ্লবী কবির কবিতাতেও এই সমন্বয়ের সুরটি বেজে ওঠেনি, যেমন বাজেনি অন্যান্য গীতিকবিদের কবিতাতেও। এ সুর আল মাহমুদের একান্ত নিজস্ব এবং এ গীতময় সমাজবাদী ভাষ্য বাংলা কবিতায় অভিনব। দীর্ঘদিন ধরে উপনিবেশের অধীনে থেকে অভ্যস্ত আপাত স্বাধীন একটি রাষ্ট্র ও জাতিকে ভাবাদর্শগত আধিপত্য

থেকে মুক্ত করতে হলে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। ঔপনিবেশিক জ্ঞান সবসময় চেয়েছে স্থানিক মূল্যকে অস্বীকার করে নিজের অনুকূলে যুক্তি ও তত্ত্বের সর্বজনীন ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে। আল মাহমুদ তাঁর সমতার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বতন্ত্র পথে, স্থানীয় ভাবজগৎ থেকে সংগৃহীত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও চেতনার আলোকে। 'খড়ের গম্বুজ' কবিতায় নাগরিক মানুষটির প্রত্যাগমন কৃষকের কাছে, কৃষিভূমির কাছে। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, কলকারখানাভিত্তিক কোনো বৃহৎ পুঁজির প্রলোভন নয়, বরং কবি স্থানীয় অর্থনীতি ও নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। *সোনালী কাবিন* কাব্যগ্রন্থে আল মাহমুদ ব্যক্ত করেছেন প্রান্তবর্গীয় শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রত্যয়। তাঁর কবিতায় মার্কসবাদী মতাদর্শের যে ছাপ পাওয়া যায় তার প্রয়োগ যান্ত্রিক নয়– সৃষ্টিশীল। মার্কসবাদী চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন বিশুদ্ধ মানবিক অভিজ্ঞতা, স্থানীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখার প্রত্যাশা এবং আধুনিক সমাজের বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিবর্তে সামাজিক বন্ধনের পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা। ত্রিশ-চল্লিশের দশকের কবিতায় প্রতিফলিত প্রথম পর্যায়ের মার্কসবাদ যে আদর্শিক ছক মেনে চলেছে, আল মাহমুদের ভাবনা সে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত।

কবিতার সমাজতত্ত্ব হলো সাহিত্য ও সমাজের এক আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্র, যেখানে কবিতাকে কেবল নান্দনিক শিল্পরূপ হিসেবে নয়, বরং সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন ও রূপান্তরের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কবিতার বিষয়, ভাষা, প্রতীক ও রূপকের ভেতর নিহিত থাকে নির্দিষ্ট যুগের সামাজিক মূল্যবোধ, শ্রেণিসম্পর্ক, লৈঙ্গিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা। কবিতার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কবিতাকে পরিণত করে সাংস্কৃতিক দলিলে। *সোনালী কাবিন* একটি প্রতীকী কাব্য, এখানে গ্রাম যেমন ধনতান্ত্রিক বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াইরত যৌথ চেতনার প্রতীক, অন্যদিকে নগরসভ্যতা পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধির ভূমিকায় অবতীর্ণ। ভূমি-ফসল, নারী, শ্যাম বা সোনালি বর্ণ, প্রেম-বিয়ে– সবই মাহমুদের প্রতীকী বয়ান এবং নতুন আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধ বিনির্মাণের অংশ। সত্তরের দশকে দেশের ক্রান্তিকালে জাতীয়তাবাদী চেতনার উজ্জীবনে আল মাহমুদ কাব্যচর্চা করেছেন, বিস্মৃত জাতিকে অতীত ঐতিহ্য এবং লোকাচারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে উন্মোচন করেছেন কেন্দ্র ও প্রান্তে বিদ্যমান বিভাজনের রাজনীতির স্বরূপ। লোকসংস্কৃতি-পুরাণ-ঐতিহ্য-ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন, নারীর অবস্থান, ফসলের সুষম বণ্টনের দাবি– বস্তুবাদী চিন্তাচর্চার এই জায়গাগুলোকে তিনি কাব্যের নান্দনিক ছায়ায় নিয়ে এসেছেন। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সঙ্গে কাব্যের সুষমাকে তিনি যেভাবে মিলিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যে বিরল। আল মাহমুদের *সোনালী কাবিন* জাতিসত্তার নিজস্বতায় প্রত্যাবর্তনের মন্ত্র, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্যের এক মৌলিক দলিল।

তথ্যনির্দেশ

১ অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান, *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা* (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০১৩), পৃ. ১৪

২ শিপ্রা সরকার, *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব: প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'* (ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ১৯

৩ *সোনালী কাবিন* কাব্যগ্রন্থের নামের বানান গ্রহণ করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১০) গ্রন্থ থেকে।

৪ হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ২১১

৫ আল মাহমুদ, *কবির মুখ* (ঢাকা: আদর্শ, ২০১৩), পৃ. ২০২

৬ তদেব, পৃ. ১২৯

৭ তদেব, পৃ. ১৪৭

৮ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর* (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০২), পৃ. ১৩৬

৯ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৩) পৃ. ৩২

১০ রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

১১ সুমিতা চক্রবর্তী, *আধুনিক কবিতার চালচিত্র* (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৯৬), পৃ. ৩১

১২ ফজলুল হক তুহিন, *আল মাহমুদের সোনালি কাবিন: পাঠ পর্যালোচনা* (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০২৪), পৃ. ৭৬

১৩ আল মাহমুদ, *কবির মুখ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

১৪ খন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা: অন্তরঙ্গ অবলোকন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ৩৪

১৫ দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮), পৃ. ২৩২

১৬ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পোস্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য* (কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭), পৃ. ৭৬

১৭ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস : আদিপর্ব (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৬২

১৮ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৬১

১৯ তদেব, পৃ. ৭৯

২০ ফজলুল হক তুহিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭

২১ মোহাম্মদ আজম, *কবি ও কবিতার সন্ধানে* (চট্টগ্রাম: কবিতাভবন, ২০২০), পৃ. ১৯৬

২২ খন্দকার সাখাওয়াত আলী, *আন্তোনিও গ্রামসি জীবনসংগ্রাম ও তত্ত্ব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ৪০

২৩ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

২৪ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১

২৫ তদেব, পৃ. ৩৫৩

২৬ রায়হান রাইন, *বাংলার দর্শন : প্রাক উপনিবেশ পর্ব* (ঢাকা: প্রথমা, ২০১৯), পৃ. ৩৫

২৭ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

২৮ তদেব, পৃ. ৬৯

২৯ তদেব

৩০ তদেব, পৃ. ৬৭

৩১ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩২ তদেব, পৃ. ৬৯

৩৩ তদেব, পৃ. ৭০

৩৪ তদেব, পৃ. ৬৮

৩৫ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৩৬ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৩৭ আল মাহমুদ, *কবির মুখ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

৩৮ নির্মলেন্দু গুণ, *নির্বাচিতা* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ২৪৭

৩৯ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬২

৪০ তদেব, পৃ. ৬৮

৪১ ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ: মার্কসীয় চেতনার আলোকে*, ভাষান্তর কাবেরী বসু (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজিন্সি প্রা. লি. ১৯৯৯), পৃ. ১২

৪২ শামসুর রাহমান, *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৩৬৯

৪৩ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৪৪ তদেব, পৃ. ৮১

৪৫ বিষ্ণু দে, *কবিতাসমগ্র-১* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. ১৯৮৯), পৃ. ২৪৯

৪৬ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯